ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▷

স্তন ক্যান্সারের ভয়কে জয় করতে হবে

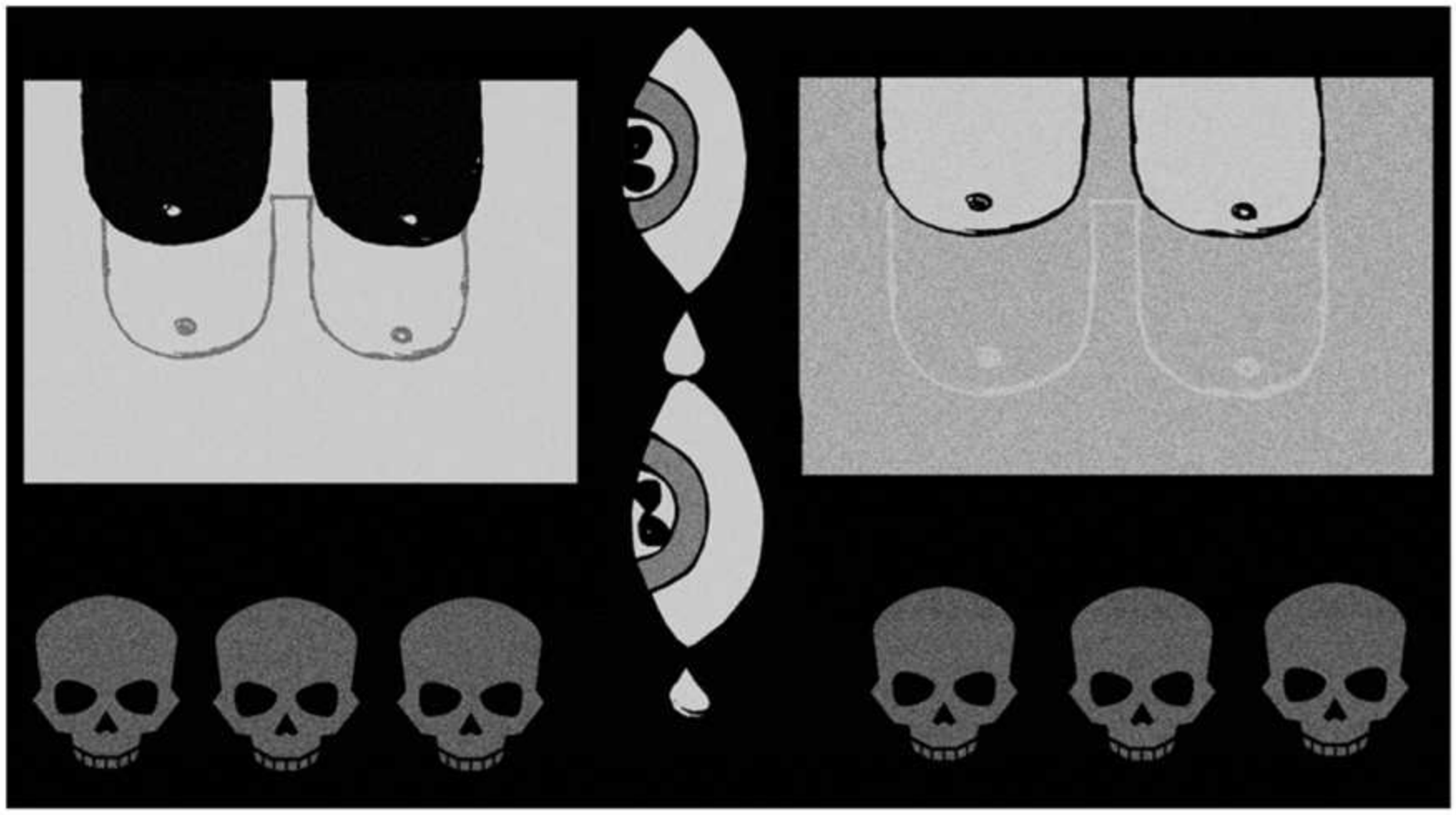

স্তনের কোনো অংশে কোষপিণ্ড বা টিউমার থাকলে, চামড়া মোটা হয়ে গেলে তা আপনি হাতের আঙুলের তালু দিয়ে পরীক্ষা করার সময় ধরা পড়বে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুল দিয়ে পুরো স্তন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন, প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যান্সার ধরা পড়লে এই প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা ও সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এ কথা বিশ্বের অধিকাংশ উঠতি বয়সী মেয়ে এবং বয়স্ক মহিলা জানেন না

পৃথিবীর কোথাও না কোথাও স্তন ক্যান্সারের কারণে প্রতি ৭০ সেকেন্ডে একজন মহিলা মৃত্যুবরণ করে। স্তন ক্যান্সার বিশ্বের এক অন্যতম নীরব ঘাতক।

স্তনে রয়েছে এক ধরনের গ্ল্যান্ড বা লালাগ্রন্থি, যাকে বলা হয় লবিউল (Lobule)। এই লবিউলে তৈরি হয় দুধ। লবিউল থেকে অসংখ্য পাতলা বা সরু নালির মধ্য দিয়ে দুধ পৌঁছে স্তনের বোঁটায় (Niple)। স্তনের কোষসমষ্টিতে (Tissue) আরো থাকে চর্বি, লিম্ফনোড (Lymphnode), রক্তনালি ও সংযোজক পেশি। দুগ্ধনালির কোষের ভেতরের দেয়ালে সৃষ্ট ক্যান্সারকে বলা হয় ডাক্টাল বা নালির কারসিনোমা (Ductal Carcinoma)। আর লবিউলে সৃষ্ট ক্যান্সারকে বলা হয় লবিউলার কারসিনোমা (Lobular Carcinoma)। স্তনে এই দুই ধরনের ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। উৎপত্তিস্থল থেকে ক্যান্সারকোষ যদি আশপাশের কোষসমষ্টিতে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় ইনভেসিভ (Invasive) বা আক্রমণমূলক ক্যান্সার। টিউমার থেকে ক্যান্সারকোষ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে তাকে মেটাস্ট্যাসিসও (Metastasis) বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মহিলারা শীর্ষস্থানে থাকা চর্ম ক্যান্সারের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্তন ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়। পুরুষেরও স্তন ক্যান্সার হতে পারে, তবে তা বিরল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২৩ হাজার পুরুষ এবং দুই লাখ ৩০ হাজার মহিলা নতুনভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যান্সারেই মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের ২২.৯ শতাংশ ইনভেসিভ ক্যান্সারের শিকার। সব রকম ক্যান্সার মৃত্যুর মধ্যে ১৮.২ শতাংশ মৃত্যু হয় স্তন ক্যান্সারের কারণে। ২০১২ সালে ১৭ লাখ মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে পাঁচ লাখ ২১ হাজার মারা যায়। অনুন্নত দেশের চেয়ে উন্নত দেশে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেশি। মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে এবং এ কারণে বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ বেশি হয়। উন্নত দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও লাইফস্টাইল স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ার কারণে বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো স্তনে থাকে কোটি কোটি কোষ। প্রতিনিয়তই অসংখ্য কোষ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোষ তৈরি হয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলে। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ প্রস্তুত ও বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি শরীরে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কোনো বিশেষ অবস্থা বা বস্তুর কারণে কোনো কোষের জিনের গঠন পরিবর্তন হয়ে গেলে সেই কোষ শরীরের কেন্দ্রীয় হুকুম ও বিধিনিষেধ অমান্য করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে। এই কোষ তখন আর অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না। মাস থেকে বছরের মধ্যে এই কোষ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে নির্ণয়সাধ্য একটি কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। এরূপ কোষপিণ্ডকে আমরা টিউমার বলে থাকি। টিউমারের আকার বৃদ্ধির জন্য সাধারণত অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এই সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে টিউমার একটি মটরদানার চেয়ে বড় হয় না। টিউমারে রক্ত সরবরাহ থাকার কারণে টিউমার থেকে ক্যান্সারকোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিকর ক্যান্সারকোষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ইনভেশন বা মেটাস্ট্যাসিস।

স্তন ক্যান্সারের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে—মাথা ব্যথা, স্তনে ব্যথা, স্তনের কোনো অংশ ফুলে যাওয়া, স্কিন র‌্যাশ বা চামড়ার ফুসকুড়ি, স্তনের কোনো অংশের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া বা চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া, স্তনে লাম্প বা কোষপিণ্ডের উৎপত্তি হওয়া ইত্যাদি। তবে এটা মনে রাখতে হবে, সব কোষপিণ্ড ক্যান্সারের কারণে সৃষ্টি হয় না এবং এসব কোষপিণ্ড ক্ষতিকর নাও হতে পারে। ক্ষতিকর হোক বা না হোক, স্তনে এ রকম কোষপিণ্ড ধরা পড়লে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পিণ্ডের ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। স্তনের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে বা নজরে এলে দেরি না করে তা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের নজরে আনতে হবে। সচরাচর স্তন ক্যান্সার হলে যেসব অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে রয়েছে স্তনে কোষপিণ্ডের উপস্থিতি, বগলের নিচে ব্যথা বা স্তনের ব্যথা, যা ঋতুস্রাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়; স্তনের চামড়া কমলার মতো লাল হয়ে যাওয়া, স্তনের বোঁটার ওপর বা আশপাশে র‌্যাশ বা ফুসকুড়ি, বগলের নিচে ফুলে যাওয়া বা পিণ্ডের উৎপত্তি হওয়া, স্তনের কোনো অংশের টিস্যু বা কোষসমষ্টি মোটা বা পুরু হয়ে যাওয়া, কোনো একটি স্তনের বোঁটা থেকে তরল পদার্থ বা রক্তমিশ্রিত তরল পদার্থ বের হওয়া, স্তনের বোঁটার আকার-আকৃতি পরিবর্তন হওয়া, স্তনের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন আসা, স্তনের বোঁটার চামড়া বা স্তনের চামড়া খসে যাওয়া, আঁশ খসে পড়া অথবা ছোট ছোট হালকা-পাতলা টুকরো খসে পড়া ইত্যাদি।

গত ২ জানুয়ারি জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, জিন (Gene), পরিবেশ বা কোনো বস্তু নয়, ভাগ্য খারাপ হওয়াই অনেক ক্যান্সারের মূল কারণ। বহু মানুষ আজীবন ধূমপান না করে বা সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করেও লাং ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। আর অনেকেই সারা জীবন ধূমপান করেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে না। এটা দৈবচক্র ছাড়া আর কিছু নয়। কে কখন কিভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে, তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা স্তন ক্যান্সার কেন হয় তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে বিশেষ করে বহু মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে, অনেকে মারাও যাচ্ছে অথচ অন্যদিকে লাখো কোটি মহিলা কোনো সমস্যা ছাড়াই দিব্যি সুস্থ থেকে জীবন অতিবাহিত করছে। তবে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা স্তন ক্যান্সারের জন্য কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টরকে দায়ী করেন। এর মধ্যে রয়েছে মহিলাদের বয়স। মহিলাদের বয়স যত বেশি বাড়ে ক্যান্সারের ঝুঁকিও তত বেশি বাড়ে। ৫০ এবং তদূর্ধ্ব বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৮০ শতাংশ। জন্মগতভাবেও মহিলারা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। যেসব মহিলার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের স্তন বা ওভারি ক্যান্সার আছে বা ছিল, তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্যান্সার জন্মগত নয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। যেসব মহিলা স্তন ক্যান্সার জিন ১ এবং ২ (BRCA 1 এবং BRCA 2) বহন করে, তাদের স্তন ও ওভারি ক্যান্সারের প্রবল ঝুঁকি থাকে। এসব জিন জন্মগতভাবে আসতে পারে। টিপি ৫৩ (টিউমার প্রোটিন) নামক জিন বহনকারী মহিলারাও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকে। কারো একবার স্তন ক্যান্সার হলে পরবর্তী সময়ে আবার ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কোনো মহিলার স্তনে বেনাইন (ক্ষতিকর নয়) টিউমার থাকলে, তাদের পরে ক্ষতিকর স্তন টিউমার হতে পারে। যেসব মহিলার স্তনের টিস্যুর ঘনত্ব বেশি, তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেসব মহিলার স্বাভাবিক সময়ের আগে এবং স্বাভাবিক সময়ের পর ঋতুস্রাব শুরু ও বন্ধ হয়, তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কারণ তাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন (Estrogen) অনেক বেশি সময় ধরে সক্রিয় থাকে। ইস্ট্রোজেন স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। স্থূল মহিলারা স্বাভাবিক ওজনের মহিলাদের চেয়ে স্তন ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়। স্থূল মহিলাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন বেশি থাকে বলে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেশি। মদ্যপায়ী মহিলারা স্তন ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়। এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যানের রেডিয়েশনের কারণেও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রতিস্থাপন (Hormone Replacement Therapy) থেরাপিকেও স্তন ক্যান্সারের অন্যতম এক কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। স্তনে কসমেটিক সার্জারি করলে স্তন ক্যান্সারের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ব্রেস্টফিডিং বা স্তনদায়ী মহিলারা স্তন ক্যান্সারে কম আক্রান্ত হয়। সময়মতো শনাক্ত না করা গেলে এবং ব্যবস্থা না নিলে ক্যান্সার ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং হাড়ের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করতে পারে। অনেক স্তন ক্যান্সারের ব্যথা না থাকার কারণে এর প্রতি কেউ তেমন মনোযোগ দেয় না। অনেক সময় যখন ক্যান্সার ধরা পড়ে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

স্তন ক্যান্সার শনাক্তের জন্য আপনি নিজের পরীক্ষা নিজেই করতে পারেন। ওপরে আমি স্তনের যেসব অস্বাভাবিকতার কথা উল্লেখ করেছি, তা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করুন এবং অনুভব করতে চেষ্টা করুন। স্তনের কোনো অংশে কোষপিণ্ড বা টিউমার থাকলে, চামড়া মোটা হয়ে গেলে তা আপনি হাতের আঙুলের তালু দিয়ে পরীক্ষা করার সময় ধরা পড়বে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুল দিয়ে পুরো স্তন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন, প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যান্সার ধরা পড়লে এই প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা ও সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এ কথা বিশ্বের অধিকাংশ উঠতি বয়সী মেয়ে এবং বয়স্ক মহিলা জানেন না। উঠতি বয়সী মেয়েদের ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতির কথা জানাতে হবে এবং শেখাতে হবে। কারণ তাদের অনেকেরই এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না। সময়মতো ক্যান্সার শনাক্ত করা হয়নি বা যায়নি বলে অনেক মহিলা এখন বিপর্যয়ের মুখোমুখি—এটা আমি জানি। আমি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করি এবং ক্যান্সার শনাক্তকরণে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা শেখাই। আমি মনে করি, মা-বাবাদের এই ভূমিকা পালন করা উচিত। নিজের স্তন নিজে কিভাবে পরীক্ষা করা হয় তার সচিত্র প্রতিবেদন ইন্টারনেটে গেলেও পাওয়া যাবে। এ ছাড়া চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। স্তন পরীক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ম্যামোগ্রাফি। স্তন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্তনে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ আপনাকে ম্যামোগ্রাম করার পরামর্শ দেবেন। তবে ম্যামোগ্রাফির মাধ্যমে স্তন পরীক্ষা ইদানীং বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী সংগঠন, রোগীদের গ্রুপ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না কখন ম্যামোগ্রাফি শুরু করতে হবে বা কতবার কত দিনের জন্য করতে হবে। কেউ মনে করেন, মহিলাদের বয়স ৪০-এ পৌঁছলে রুটিন ম্যামোগ্রাফি শুরু করা দরকার। আবার কেউ বলেন, ৪০-এর পরিবর্তে ৫০ বছর বয়সে এই স্ক্রিনিং শুরু করা উত্তম। আবার অনেকের মতে, শুধু চরম ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ বছর বয়সে রুটিন পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। ২০১২ সালে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন লিখেছে, ম্যামোগ্রাফির জন্য ৪০ বছর বয়স অতি উত্তম। ২০১২ সালে ল্যানসেট জার্নালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ম্যামোগ্রাফি পরীক্ষা স্তন ক্যান্সারের মৃত্যুঝুঁকি থেকে রোগীদের রক্ষা করতে পারে। তবে প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে, ম্যামোগ্রাফি অনেক সময় ভুল পজিটিভ তথ্য দিয়ে থাকে। এ কারণে মহিলাদের অপ্রয়োজনীয় বায়োপসি থেকে শুরু করে ক্ষতিকর নয় এমন টিউমার পর্যন্ত অপারেশনের মাধ্যমে কেটে বাদ দিতে হয়। এতে মহিলারা চরম মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়। তবে ২ডি ম্যামোগ্রামের সমন্বয়ে ৩ডি ম্যামোগ্রাম করা হলে এই ভুল তথ্য পাওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

বায়োপসির মাধ্যমে সঠিকভাবে ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব। স্তনের অস্বাভাবিক টিস্যু, কোষপিণ্ড বা টিউমার থেকে কিছু কোষ অপারেশনের মাধমে কেটে বের করে এনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জানা যায় তা ক্যান্সারকোষ কি না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সারের ধরন ও পর্যায় জানা যায়। স্তনের এমআরআই (ম্যাগনেটিক রেজনেন্স ইমেজেস) করেও ক্যান্সার শনাক্ত করা হয়। এমআরআই একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারে। স্ট্যাজিং (Staging) হলো অন্য এক পরীক্ষা, যার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা শরীরের ক্যান্সারের সর্বশেষ পর্যায় নির্ণয় করতে পারেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে এটাও জানা সম্ভব, ক্যান্সারকোষ স্বস্থানে আবদ্ধ আছে কি না, নাকি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। টিউমার কত বড় হয়েছে, ক্যান্সারে লিম্ফনোড আক্রান্ত হয়েছে কি না, হলে কতগুলো আক্রান্ত হয়েছে বা ক্যান্সারকোষ কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তা-ও এই পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব। ক্যান্সারের প্রকৃত অবস্থা জানা না গেলে চিকিৎসার ধরন ও প্রকৃতি কী হবে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্যান্সার শনাক্তের পর স্ট্যাজিং করা হয়। স্ট্যাজিং করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা, ম্যামোগ্রাম, বুকের এক্স-রে, হাড়ের স্ক্যানিং এবং সিটি (Computed Tomography) বা পিইটি (Positron Emission Tomography) স্ক্যানিং করার পরামর্শ দেবেন। এসব পরীক্ষার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা শুরু করবেন।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাবি
drmuniruddin@gmail.com